The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

হাওড়া জেলার মন্দির ভাস্কর্যে বাংলার সমাজজীবনের প্রতিফলন (১৭শ -১৯শ শতক)

Moumita Nandi

M. A in Ancient Indian History & Culture (University Of Calcutta),M.Phil in History (Vidyasagar University), SACT, Department of History,Uluberia College, mou.nandii003@gmail.com

সারসংক্ষেপঃ

হাওড়া জেলায় ভাস্কর্য সজ্জায় সজ্জিত মন্দির সমূহ বাংলা তথা এই জেলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য বহন করে থাকে। খ্রিস্টীয় সতেরো শতক থেকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে নিবদ্ধ ফলক সজ্জায় সজ্জিত মূর্তি ভাস্কর্যের আধিক্য দেখা যায়। যার মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে নিজস্ব শিল্প শৈলীর। এই ধারার অব্যাহত ছিল আঠারো উনিশ শতক পর্যন্ত। এই জেলায় চালা, রত্ন রীতিতে নির্মিত মন্দির স্থাপত্যের গাত্রে অলংকৃত সামাজিক চিত্র ফলক শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজ তথা আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় করায় না, এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারি। সাধারণত মন্দিরের সম্মুখভাগের দেওয়ালে ফলক সজ্জায় উৎকীর্ণ রয়েছে ধর্মীয় আখ্যানমূলক কাহিনীর পাশাপাশি সমকালীন সমাজের বাস্তব জীবন। এখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, জীবিকা, কৃষিকাজ, শৈব সন্ন্যাসী, নৃত্য, ক্রীড়া, উৎসব প্রভৃতি দৃশ্যাবলী লক্ষ্যনীয়। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রের পাশাপাশি মন্দিরগাত্রস্থ ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ ইউরোপীয় সৈন্য, রনভেরীর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সামাজিক দিকের সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তনের রূপটিও প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাস্কর্য সমূহ থেকে সমকালীন বাংলা তথা হাওড়া জেলার সামাজিক স্তরবিন্যাসের কাঠামোটি এমনকি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নানা দিক পুনর্গঠন করা সম্ভবপর হয়ে পড়ে। এককথায় বলা যায়, এই জেলার মন্দির পরিকাঠামো এবং ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ নানা দৃশ্যাবলী কেবল শিল্পের পরিচয় বহন করে না, বরং বাংলার সামাজিক, লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাথমিক উৎস হিসাবেও গণ্য করা যায়।

শব্দ সুচক : *মন্দির, টেরাকোটা ফলক, জীবিকা, লোকজ সংস্কৃতি, ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা।*

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভূমিকা :

হাওড়া জেলার মন্দির স্থাপত্য সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান বহন করে। মন্দির স্থাপত্য মূলত ধর্মীয় স্থাপত্য রূপে পরিগণিত হলেও ঐতিহাসিক তথ্যের ভাণ্ডার বা দলিল হিসাবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই জেলার মন্দির স্থাপত্য ও মন্দির গাত্রস্থ ভাস্কর্য বাংলার শিল্প ঐতিহ্যের এক অমুল্য সম্পদ। প্রাকৃতিকভাবে পাথরের অপ্রতুলতা ও নদীকেন্দ্রিক এই জেলায় পলিমাটির সহজলভ্যতার কারণে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠা মন্দির স্থাপত্য সমূহ মূলত গঠিত ইট ও পোড়ামাটি দিয়ে। মন্দির শিল্পীরা মন্দির গাত্রে দেবলোকের কাহিনী যেমন সুনিপুনভাবে বর্ণনা করেছেন, তেমনই মর্ত্যলোকের মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় তুলে ধরেছেন। মন্দির ভাস্কর্যে দেখা যায় উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে আপামর মানুষের জীবনযাত্রা, লোকজ সংস্কৃতি, নারীপুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, বৃত্তিগত জীবন, নানা ক্রীড়া দৃশ্য, বিনোদন রূপে গীতবাদ্য ও নৃত্যচর্চার বিভিন্ন দৃশ্যাবলী। এরই সাথে দেখা যায় ইউরোপীয়ানদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, শিকারের দৃশ্য। মন্দির শিল্পীরা বাংলার মন্দির স্থাপত্যের নিজস্ব ধারার সাথে বিদেশী রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এক অনন্য মিশ্র ধারার প্রবর্তন করেন। যা থেকে সহজেই বলা যায় যে, বিদেশীদের আগমনের সাথে সাথে মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্যেও ইউরোপীয়ানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মন্দির শিল্পীরা যেসব চিত্র মন্দির গাত্রালংকরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা আজ সামাজিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল রূপে বিবেচ্য হতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

বাংলার মন্দির স্থাপত্য কাঠামো ও মন্দিরগাত্রে অলংকৃত ভাস্কর্য নিয়ে বহু গবেষণা হলেও হাওড়া জেলার মন্দির ভাস্কর্যে সমাজজীবনের নানান দৃশ্য যে রূপায়িত হয়েছে তার গবেষণা এখনও তুলনামূলকভাবে সীমিত। গবেষণায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরের স্থাপত্য কাঠামো,বহির্গাত্রে ভাস্কর্য সজ্জায় সজ্জিত বিভিন্ন ধর্মীয় মূর্তি এবং অলংকরণের ওপর নিবদ্ধ। ভাস্কর্য সজ্জায় প্রতিফলিত সামাজিক ইতিহাস প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলায় ১৬শ–১৯শ শতকে টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের বিকাশ ও মন্দির স্থাপত্যের আঞ্চলিক রীতি, নির্মাণ-শৈলী স্বতন্ত্র রূপে গড়ে ওঠে (McCutchion, 1972)। পোড়ামাটির ফলক সজ্জায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক দেবদেবীর সমাবেশ ছাড়াও সমাজজীবনের নানাবিধ দৃশ্যাবলী খুঁজে পাওয়া যায়। মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক শিল্পে দেবদেবীর লীলা ও মানুষের জীবনধারা দুটিরই পাশাপাশি সহবস্থান দেখা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় , ১৯৭১)। সাধারণত মন্দির গাত্রে ভাস্কর্য অলংকরনে শিল্পীরা সমাজের নানাবিধ দৃশ্যাবলী রূপায়নে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মন্দির শিল্পীরা যেখানে বাস করতেন মূলত সেখান থেকে আহরিত সমাজজীবনের চিত্র মন্দির ফলক ভাস্কর্যে তুলে ধরেছেন (সাঁতরা, ১৯৮৩)। জীবনযাত্রার চিত্র, শিকার, নৌযাত্রা, যুদ্ধযাত্রার

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পাশাপাশি রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী, সমকালীন খেলাধুলো, গীতবাদ্য, সঙ্গীত ও নৃত্যরতা নারী, নারী ও পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং মিথুন দৃশ্য (সাঁতরা, ১৯৮৩)। এথেকে একটা বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে মন্দির শিল্পীরা তৎকালীন সময়ে জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি বৃত্তিগত জীবন দৃশ্যগুলি মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যরূপে অলংকৃত করেছেন যা বর্তমানে এক ঐতিহাসিক মুল্যবান দলিল রূপে পরিগণিত। এইসমস্ত পোড়ামাটি ফলক ভাস্কর্য বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ হাওড়া জেলার মন্দির ভাস্কর্যে বাংলার সমাজজীবনের প্রতিফলন গবেষণা নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকে নির্মিত মন্দিরসমূহের ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সামাজিক কাঠামো, জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য, ইউরোপীয় ও ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং তার সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।

এই মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষণা উদ্দেশ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- হাওড়া জেলার মন্দির স্থাপত্য কাঠামো ও ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু এবং শিল্পরীতির বিশ্লেষণ করা।
- কৃষিকাজ, বানিজ্য, নৌপরিবহণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক দিকের প্রতিফলন নিরূপণ করা।
- ভাস্কর্যে নারী পুরুষের ভূমিকা, পোশাক, অলঙ্কার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান মূল্যায়ন করা।
- নির্ভরযোগ্য প্রত্ন-ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মন্দির এবং মন্দির ভাস্কর্যকে পরিগণিত করা।
- এই জেলার মন্দির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

মন্দির স্থাপত্য কাঠামো:

হাওড়া জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে প্রধানত চালা রীতিতে নির্মিত মন্দির সর্বাধিক লক্ষ্যনীয়। বাংলা মন্দির স্থাপত্যের নিজস্ব রীতি হল এই চালা রীতি। একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা এমনকি বারোচালায় এই রীতি বিভক্ত। তবে এই জেলায় চারচালা, আটচালা মন্দিরই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। গ্রাম-বাংলায় খড়ের চারচালা ছাদবিশিষ্ট কুটিরগুলি দেখতে পাওয়া যায় চারচালা মন্দির তারই অনুকরণে নির্মিত। এই রীতিতে নির্মিত মন্দিরের শীর্ষদেশের আকার হয়ে থাকে সমত্রিভুজাকৃতি চারটি ঢালু চাল, যার নিচের বহিঃরেখাটি ধনুকের মতো বাঁকানো। সাধারণত এই ধরণের মন্দিরের ভিত্তিভূমি বর্গাকার আর প্রবেশপথ একদুয়ারি হয়। তবে চারচালা মন্দিরের সংখ্যা এই জেলায় কম। চারচালা মন্দিরের পরিবর্ধিত রূপ হল আটচালা মন্দির। মন্দির নির্মাণকারীরা প্রথাগত আটচালা কুঁড়েঘরের আদলে তৈরি করেছেন আটচালা রীতির মন্দির। বর্গাকার ভূমিতলের উপর নির্মিত এই ধরণের মন্দিরের শীর্ষ অংশের নিচের চারটি ঢালু চালের ওপরে অল্প উচ্চতার চারটি দেওয়ালের ওপরে ছোটো আয়তনের চারচালা স্থাপত্য সংযোজিত। এই রীতিতে নির্মিত মন্দিরের ওপরের ও নিচের চালগুলির কার্নিশ ধনুকের মতোই বাঁকানো হয়।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এই জেলায় চালা মন্দিরের পাশাপাশি রত্ন মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রত্ন কথাটির অর্থ হল 'চূড়া'। এই ধরণের মন্দিরের উদ্ভাবন ঘটেছে চালা মন্দিরের সঙ্গে প্রচলিত শিখররীতির মিশ্রণের ফলে। চারদিকে ঢালু ও বাঁকানো কার্নিশযুক্ত চারচালা মন্দিরের ছাদের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি চূড়া সংস্থাপিত হলে তা হবে একরত্ন মন্দির। আলোচ্য জেলায় একরত্ন মন্দিরের নিদর্শন নেই। তবে হাওড়া জেলাতে রত্ন রীতিতে নির্মিত মন্দিরের মধ্যে পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দির স্থাপত্যই দেখা যায়। মন্দির স্থপতিরা চারচালা ছাদের মধ্যবর্তী অংশে মূল রত্নটিকে বৃহৎভাবে এবং ছাদের চার কোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোটো চূড়া নির্মাণ করেন। ফলে পাঁচটি চূড়া সংস্থাপনের জন্য এই ধরণের মন্দির শৈলী 'পঞ্চরত্ন' নামে পরিচিত। নবরত্ন মন্দিরের গঠন পঞ্চরত্ন মন্দিরের মতোই। পার্থক্য শুধু চূড়ার সংখ্যার বৃদ্ধি। মন্দিরশিল্পীরা পঞ্চরত্নের মতো ছাদের চারকোণে চারটি চূড়া আর কেন্দ্রীয় চূড়ার জায়গায় ছোটো চারচালা ধরণের স্থপতি নির্মাণ করে তার মধ্যবর্তী স্থানে একটি বৃহৎ আকারের চূড়া আর তার চারকোণে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোটো চূড়া সংস্থাপিত করেন। এর ফলে নয়টি চূড়া সন্নিবেশের ফলে এই ধরণের স্থাপত্য রীতি নবরত্ন মন্দির রূপে পরিচিত। আলোচ্য জেলায় নবরত্ন মন্দির শৈলীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত আসন্দা গ্রামের শ্রীধরজিউর মন্দির (১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

পলিমাটিতে গঠিত এই জেলায় মন্দির নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আগুনে পোড়া ইট। মন্দির নির্মাণের উপকরণ হিসাবে যেমন ইটের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গাঁথনির উপকরণ। হাওড়া জেলায় মন্দির নির্মাণে চুন-বালির মিশ্রণে তৈরি পলেস্তারার প্রয়োগ হয়েছে ব্যাপকভাবে।

ভাস্কর্যে অন্তর্গত সামাজিক বিষয়বস্তু :

পোড়ামাটির ফলক সজ্জায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক দেবদেবীর সমাবেশ ছাড়াও সমাজজীবনের নানাবিধ দৃশ্যাবলী খুঁজে পাওয়া যায়। মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক শিল্পে দেবদেবীর লীলা ও মানুষের জীবনধারা দুটিরই পাশাপাশি সহবস্থান দেখা যায়। সাধারণত মন্দির গাত্রে ভাস্কর্য অলংকরনে শিল্পীরা সমাজের নানাবিধ দৃশ্যাবলী রূপায়নে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মন্দির শিল্পীরা যেখানে বাস করতেন মূলত সেখান থেকে আহরিত সমাজজীবনের চিত্র মন্দির ফলক ভাস্কর্যে তুলে ধরেছেন। যেমন, সেসময়ে শৈব মঠধারী যোগী মোহান্তদের জীবনযাত্রা, ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গি সমাজের সমকালীন নানাবিধ বিলাসব্যসনযুক্ত জীবনযাত্রার চিত্র, শিকার, নৌযাত্রা, যুদ্ধযাত্রার পাশাপাশি রয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী, সমকালীন খেলাধুলো, গীতবাদ্য, সঙ্গীত ও নৃত্যরতা নারী, নারী ও পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং মিথুন দৃশ্য। এথেকে একটা বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে মন্দির শিল্পীরা তৎকালীন সময়ে জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি বৃত্তিগত জীবন দৃশ্যগুলি মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যরূপে অলংকৃত করেছেন যা বর্তমানে এক ঐতিহাসিক মুল্যবান দলিল রূপে পরিগণিত। এইসমস্ত

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পোড়ামাটি ফলক ভাস্কর্য বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে।

শৈব সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রার বেশ কিছু দৃশ্য দেখা যায় পোড়ামাটি ফলকে। শৈব সন্ন্যাসী অর্থাৎ যারা নানা স্থানের মঠ-মন্দিরে সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখে মোহান্ত প্রথা চালু করেছিল। পোড়ামাটি ফলকে এই সব শৈব সন্ন্যাসীদের গালপাট্টা দাঁড়িসহ লম্বা কেশগুচ্ছ, মালকোঁচা বস্ত্র ও ল্যাঙট বা কৌপীন পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে কারোর হাতে শিঙা বা শঙ্খ, কারোর হাতে রয়েছে কমণ্ডলু, কেউবা দাঁড়ানো অবস্থায় ধূমপানরত, কেউবা হাঁটু মুড়ে উপবিষ্ট অবস্থায়, আবার কেউ লম্বা কেশ পরিচর্যারত। আলোচ্য জেলার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে মোহান্ত সমাজের কার্যকলাপের বিভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত আসন্ডা গ্রামের শ্রীধরনাথ জিউর মন্দিরে (১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) শৈব সন্ন্যাসী জীবন সম্পর্কিত একটি অভিনব পোড়ামাটি ফলক দেখা যায়, সেখানে শৈব সন্ন্যাসী উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছেন এবং তার সাথে যে সহযোগী রয়েছেন তার চুল চিরুনি দিয়ে পরিচর্যায় রত। পাশাপাশি আর এক সহযোগী চামর হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন। এছাড়া আমতা থানার অন্তর্গত খালনা গ্রামের দামোদর জিউর মন্দিরের গাত্রের পোড়ামাটি ফলকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে মোহান্তদের চিত্র দেখা যায়। বাগনান থানার অন্তর্গত মেল্লক গ্রামের মদনগোপাল জিউর মন্দির (১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ) ও আমতা থানার অন্তর্গত রাউতারা গ্রামের সীতারাম মন্দির (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ) গাত্রে মোহান্তদের জীবনযাত্রার দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে। পোড়ামাটি ফলকেউৎকীর্ণ মোহান্তদের এইসব জীবনযাত্রার চিত্র থেকে তৎকালীন সময়ে এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা বৃত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এই জেলায় সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত বেশ কিছু মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটি ফলকে শিকারের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে কোনো স্থাপত্যের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিকারের দৃশ্য এই প্রথম নয়। শিকার মানুষের আদিমতম বৃত্তি। মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ভিমবেটকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের গুহাচিত্রাবলীতে শিকারের দৃশ্য স্পষ্টত লক্ষণীয়। শুধু সেই যুগের মানুষ নয়, তার পরবর্তী সময়েও অর্থাৎ বাংলায় মধ্যযুগকালে শিকার নিম্নবিত্ত মানুষের বৃত্তি ছিল। কিন্তু তৎকালীন সময়ে বাংলা তথা হাওড়া জেলায় মন্দির গাত্রে শিকারের দৃশ্যাবলীতে অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রাকেই সূচিত করেছে। সাধারণত মন্দিরের ভিত্তিতলের একেবারে নিচের সারিতে এইরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। শিকারের দৃশ্যে দেখা যায় হাতি ও ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে শিকারি বন্য জন্তুকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করছে, এছাড়া ধনুর্ধারী ও যোদ্ধা ঢাল ও তরোয়াল নিয়ে শিকারকে আক্রমণ করছে। আমতা থানার অন্তর্গত অমরাগড়ির দধিমাধব মন্দিরের দেওয়ালে শিকারের দৃশ্য সম্পর্কিত একাধিক প্যানেল আছে। এর মধ্য রয়েছে একটি বাঘকে দুজন অশ্বারোহী মিলে হত্যা করার দৃশ্য, আবার রয়েছে বাদ্যভাণ্ডসহ পদাতিক যাদের পরনে সাহেবী পোশাক। মন্দির শিল্পীরা সেময়ে ইউরোপিয়ান বা ফিরিঙ্গিদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত শিকারকেও মন্দির ভাস্কর্যে

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য মন্দির প্যানেলে বন্দুক হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ফিরিঙ্গি সাহেবের প্রতিমূর্তি রয়েছে। মেল্লকের মদনগোপাল জিউর মন্দির গাত্রে এইরূপ শিকারের দৃশ্য পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে।

শিকারের দৃশ্য ছাড়াও দেশী ভূস্বামী বা ইউরোপীয় সাহেবদের পালকি বা দোলায় প্রমোদ ভ্রমণরত পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়। যেখানে 'সুখাসন' নামক পালকিতে ভ্রমণরত ইউরোপীয় সাহেব বা ভূস্বামী, যিনি পালকিতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশয়ন অবস্থায় রয়েছেন এবং তাঁর হাতে রয়েছে তামাক সেবনের নল। সেই সঙ্গে ঠিক তাঁর পালকির নিচে রয়েছে পোষ্য কুকুর। মন্দির শিল্পীরা এই ধরনের বিষয়বস্তুযুক্ত ফলক তৈরির অনুপ্রেরণা পেয়েছিল সম্ভবত তৎকালীন সময়ে ইউরোপীয় সাহেব বা কোনো দেশীয় অভিজাত ভূস্বামী যারা গ্রামাঞ্চলে নানা স্থানে যাতায়াত করতেন তাঁদের চলাফেরা ও চালচলন লক্ষ্য করেই। এই জাতীয় পোড়ামাটি ফলকের নিদর্শন দেখা যায় আলোচ্য জেলার অমরাগড়ির দধিমাধব আটচালা মন্দির, আসন্ডার শ্রীধরনাথ জিউর মন্দির, মারঘুরালির দামোদর জিউর মন্দির এবং রাউতারা সীতারামের আটচালা মন্দির।

শিকার দৃশ্যের পাশাপাশি নৌদৃশ্যের বহু পোড়ামাটি ফলক লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে পর্তুগীজ জলদস্যুদের জাহাজ, জমিদারদের নৌকা ভ্রমণের দৃশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য জেলায় আমতা থানার অন্তর্গত ঝিখিরা গ্রামের শ্যামসুন্দর আটচালা (১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মন্দির গাত্রে পর্তুগীজ জলদস্যুদের কর্তৃক ধৃত এদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ বোঝাই জাহাজের একটি দৃশ্য পোড়ামাটি ফলকে দেখা যায়। এছাড়া নৌকা ভ্রমণের একটি দৃশ্য দেখা যায় আমতার রাউতারা গ্রামের সীতানাথের আটচালা মন্দিরে (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ)। যেখানে পাত্রমিত্র সমেত জমিদার বা অভিজাত ব্যাক্তির নৌকা ভ্রমণের একটি অপূর্ব দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

উপরিউক্ত দৃশ্য ফলক গুলি ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিচ্ছবি মন্দির ফলক সজ্জায় অপূর্বভাবে সুত্রধর শিল্পীরা উপস্থাপিত করেছেন। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের দৈনন্দিন জীবনের বহু দৃশ্য পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য খালনা গ্রামের দামোদর মন্দিরের (১৮শ শতক) গাত্রে উৎকীর্ণ কলসি কাঁখে কুলবধূর ভাস্কর্য সম্মলিত পোড়ামাটির ফলকটি। কলসি নিয়ে জল আনা গ্রাম্যবধূদের সাংসারিক নিত্য কাজকর্মের মধ্যে এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। মন্দির শিল্পীরা এইদিকটি খুব সুন্দরভাবে মন্দির গাত্রে উপস্থাপিত করেছেন। এইরূপ আরও একটি দৃশ্য আলোচ্য মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে যেখানে এক কাঁখে কলসি অন্য কোলে ছেলে সহ নারী এবং স্তনদানরত নারীমূর্তি। স্তনদানরত নারীমূর্তি একটি পোড়ামাটির ফলক কুমারপুর গ্রামের মন্দিরের দেওয়াল গাত্রেও রয়েছে।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের অবকাশ জীবন সম্পর্কিত দৃশ্য পোড়ামাটি ফলকসজ্জায় উৎকীর্ণ হয়েছে। এই অবকাশ জীবন সম্পর্কে যে দিকটি আলোচ্য জেলার মন্দিরগাত্রে শিল্পীরা যে দিকটি উপস্থাপিত করেছেন তা হল 'শালভঞ্জিকা'। সাধারণত অবসর সময়ে কুলবধূরা পশুপাখি প্রতিপালন করতেন। পশুপাখিকে কোলে নিয়ে কিংবা পোষা হরিণকে গাছের ডাল নুইয়ে পাতা খাওয়ানোয় ব্যস্ত নারীমূর্তির ভাস্কর্য ফলক দেখা যায়। এইরূপ ফলক সাধারনভাবে 'শালভঞ্জিকা' নামে পরিচিত। এইরূপ মূর্তিফলক আলোচ্য জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মাজুক্ষেত্র গ্রামের বুড়োশিবের আটচালা মন্দির গাত্রে (১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ রয়েছে। অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত আরও এক ধরনের পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়। তা হল, পরিচারিকা হিসাবে গ্রাম্য নারীর ভূমিকা। তৎকালীন সময়ে বিত্তশালী কিংবা ধনী জমিদারদের গৃহে পরিচারিকাদের যে একান্ত প্রয়োজন সেই দৃশ্য মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে অন্যতম বিষয়রূপে রূপায়িত হয়েছে। এইরূপ দৃশ্যের ফলক রয়েছে খালনা গ্রামের দামোদর জিউর মন্দিরগাত্রে। যেখানে পাখা হাতে একটি নারীমূর্তি আছে। সীতাপুর গ্রামের শ্রীধরনাথ জিউর রাসমঞ্চে পোড়ামাটি ফলকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় বাবুর পদসেবারত এক নারী। অনুমেয়, হয়তো তিনি অর্ধাঙ্গিনী নয়তো বা তিনি পরিচারিকা হিসাবে কর্মরত।

সপ্তদশ থেকে উনবিংশ এই তিন শতক ধরে মন্দির গাত্রে মানুষের সমারোহ এবং তারই সাথে নানাবিধ পোশাকেরও বৈচিত্র্যের সম্ভার দেখা যায়। পোশাকের বৈচিত্র্য দেখে বোঝা যায় অভিজাত ও অনভিজাত সমাজের এই দুই শ্রেণিই মন্দিরের ফলক সজ্জায় স্থান পেয়েছে। জুলেখা হক লক্ষ্য করেছেন "বাংলার মন্দিরের মানুষের পোশাকের ধরণ মুঘল কোর্ট অনুযায়ী।" কিন্তু তা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ মন্দিরের অলংকরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে যেখানে মুঘল কোর্ট অনুযায়ী পোশাকের তুলনায় সাধারণ মানুষের পোশাকের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। এতদস্বত্বেও বলা যায় যে, বাংলার মন্দিরের মুঘল পোশাকের ধরণ নিঃসন্দেহে এসেছিল। কারণ মন্দিরগাত্রে উপস্থিত নারীর পরিধান সাধারণত ঘাঘরা-ব্লাউজ-ওড়না। তবে উনবিংশ শতকে শাড়ির নানারকম ব্যবহার মন্দিরে দেখা যায়। অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় শাড়ি পরার চল দেখা যায় এবং সেই চল মন্দিরের ভাস্কর্য ফলকে প্রতিফলিত হয়েছে। পুরনো পদ্ধতিতে শাড়ি পরা যাকে আটপৌরে করে শাড়ি বলা হয়। তারই নিদর্শন সবথেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত অনভিজাত নারীদের গায়ে শাড়ি ছাড়া আর কোন বস্ত্র থাকত না। শাড়ীর আঁচল বা ওড়না দিয়ে ঘোমটা প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। মন্দির স্থাপত্যের টেরাকোটা ফলকে বিদেশি মহিলাদের পোষাক হিসাবে দেখা যায় গাউন সদৃশ ফ্রক বা জামা, সেটি গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এবং সেই সঙ্গে লম্বা হাতা বিশিষ্ট। এই লম্বা হাতার নিম্ন অংশ নক্সাযুক্ত তো কোমরের অংশটি চাপাভাবে সেলাই করা দেখা যায়। উনিশ শতকের মন্দিরে ফ্রিল দেওয়া গাউন পরা পাখা হাতে মেমসাহেবের মূর্তি মন্দিরগাত্রে প্রায়ই দেখা যায়। মন্দিরের ভাস্কর্য ফলকে

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অভিজাত থেকে সাধারণ নারী এমনকি মেম সাহেবের পরিহিত পোশাকের ভাঁজ শিল্পী তাঁর শিল্প দক্ষতার সাথে অলংকৃত করেছেন।

এই জেলার বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ টেরাকোটা ফলকে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষের বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। মন্দিরের গাত্রালংকার রূপে ঢাক, ঢোল, বেহালা, বীণা, বাঁশি ও শিঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বাদক-বাদিকা। এইরূপ টেরাকোটা ফলক সজ্জার নিদর্শন দেখা যায় রাউতারা গ্রামের সীতারামের আটচালা মন্দিরে, কুমারপুর গ্রামের রাসমঞ্চের দেওয়ালে।

মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকসজ্জায় সমাজচিত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু রূপে সাধারণ মানুষের নিত্যকর্ম ও জীবিকার দৃশ্য যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি তার পাশাপাশি সেকালের খেলাধুলার কিছু দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মল্লযুদ্ধ বা মল্লক্রীড়া। যদিও এই ক্রীড়া প্রায় প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে এই ধরনের খেলার দৃশ্য খালনা গ্রামের দামোদর জিউর মন্দিরে (আনুমানিক ১৮শ শতক) ও আসন্ডা গ্রামের শ্রীধরনাথ জিউর (১৭৮৯খ্রিষ্টাব্দ) মন্দিরগাত্রে রয়েছে। আলোচ্য মন্দিরের টেরাকোটা ফলক সজ্জায় সামাজিক দৃশ্যের অন্যতম বিষয়বস্তুরূপে দেখা যায় বাঁশবাজির দৃশ্য। একসময় গ্রাম-বাংলায় বিভিন্ন ধরণের শারীরিক কসরত ও ভারসাম্য খেলা দেখানোর জন্য একদল ক্রীড়া প্রদর্শনকারী দেখা যেত। এই ধরণের খেলা বাঁশবাজি নামে পরিচিত। তবে অঞ্চলভেদে কোথাও কোথাও এই খেলাকে চিংড়ি খেলও বলা হত। এইরূপ দৃশ্যের নিদর্শন দেখা যায় বাগনান থানার অন্তর্গত মেল্লক গ্রামের মদনগোপালজিউর মন্দিরেরগাত্রে।

এই জেলার মন্দির ভাস্কর্যে মিথুন মূর্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নারীকে ভোগ্যবস্তু রূপে নয়, বরং শিল্পী এখানে নারী-পুরুষের উভয়েরই আবেগপূর্ণ সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রকাশকে সুন্দরভাবে রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এইরূপ মূর্তির নিদর্শন রয়েছে আমতা থানার অন্তর্গত অমরাগড়ি গ্রামের দধিমাধবের আটচালা মন্দির ও খালনা গ্রামের দামোদরজিউর মন্দিরে এবং উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত আসন্ডা গ্রামের শ্রীধরজিউর মন্দির গাত্রে।

উপসংহারঃ

বাংলার শিল্প-ঐতিহ্য ও সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান দলিল রূপে বিবেচিত হাওড়া জেলার মন্দির ভাস্কর্য। ধর্মীয় আখ্যানের অলংকরণ নয়; বরং সমকালীন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক প্রতিফলন হিসাবে মন্দির ভাস্কর্যের গুরুত্ব অসীম। ভাস্কর্যগুলিতে সামাজিক যে নানা দৃশ্যবলীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা তৎকালীন বাংলার জনজীবনের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। মন্দির ভাস্কর্যে ধর্মীয় আখ্যানমূলক কাহিনির পাশাপাশি সমসাময়িক বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি এবং সামাজিক সম্পর্ক সমান গুরুত্ব পেয়েছে। ভাস্কর্যে অন্তর্গত বিষয়বস্তু সেই সময়কালের সমাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক রুচির পরিচয় বহন

করে। তাছাড়া লিখিত ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে অনেক নির্ভরশীল তথ্য পেলেও ভাস্কর্যসমূহ থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, পেশা, সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক চর্চা যেসমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে অন্য উৎসে অবিদ্যমান। তবে বহু মন্দির অবহেলা ও প্রাকৃতিক কারণে প্রায় ভগ্নদশা প্রাপ্ত যেখান থেকে সঠিকভাবে ভাস্কর্যের মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরই সঙ্গে সংযুক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপি ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নথির অভাবের কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা মূল্যায়ন করা জটিল হয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষেত্রসমীক্ষা, ভাস্কর্যের মূর্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক সূত্রের সমন্বয়ে গবেষণাটি একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে।

REFERENCES

- Biswas, S.S. & Haque, Zulekha. (1995). Terracotta Temples of Bengal, Friendship Publishers, Calcutta.
- Biswas, S.S. (1995). Terracotta Art of Bengal, Agam Kala Prakashan, Delhi.
- Coomarswamy, Ananda K. (2008). Introduction to Indian Art, MunshiramManoharlal, New Delhi.
- Dutta, Bimal Kumar. (1975). Bengal Temples, MunshiramManoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi.
- Ganguli, Kalyan Kumar. (1983) Howrah in Perspective-Tradition and Culture, Ananda NiketanKirtishala, Howrah.
- Ghosh, Nihar. (2006). Temple Art of Late Medieval Bengal, Suchetana, Kolkata.
- Haldar, Shibabrata. and Manju. (2011). Temple Architecture of Bengal, UrbeePrakashan.
- Haque, Zulekha. (1980). Terracotta Decorations of Late Medieval Bengal Potrayal of a Society, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.
- Mc Cutchion, David. (1972). Late Mediaeval Temples of Bengal Origins and Classification, The Asiatic Society.
- Michell, George. (1963). Brick Temples of Bengal from the Archives of David Mc Cutchion, Princeton University Press, New Jersy.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার। (১৯৭১)। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- ঘোষ, নীহার। (২০১২)। বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), ভাষান্তর শাশ্বতী নিয়োগী ও ভারতী ঘোষ, অমর ভারতী, কলকাতা।
- ঘোষ , বিনয়। (২০১১)। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড), দীপ প্রকাশন, কলকাতা।
- জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ। (২০০২)। হাওড়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- রায়, প্রণব। (২০০৪)। বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 2, Issue: 1. May'26-Jul'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

- সাঁতরা, তারাপদ। (১৯৯৮)। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় স্থাপত্য, মন্দির ও মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- সাঁতরা, তারাপদ। (২০১০)। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।
- সাঁতরা, তারাপদ। (১৯৮৩)। মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র, কলিকাতা।
- সাঁতরা, তারাপদ। (১৯৭৬)। হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- সাঁতরা, তারাপদ। (২০০০)। হাওড়া, সুবর্ণরেখা।

TGJCT EST. 2025